OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 155 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 155 - 162
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

লোকবিশ্বাস, মিথ ও রহস্য নির্মাণ : প্রসঙ্গ নীহাররঞ্জন গুপ্তের গোয়েন্দা সাহিত্য

প্রসেনজিৎ কুমার
গবেষক, অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: prosenjitkumarbengali@gmail.com
0009-0008-6265-0515

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
লোকবিশ্বাস, মিথ, লোকসংস্কৃতি, ভয়, রহস্য, অপরাধ, যুক্তি, কিরীটী রায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত।

Abstract

Folk beliefs encompass a wide range of elements, including malevolent forces, ghosts and spirits, supernatural phenomena, incantations, curses, and various omens. To craft mysteries or add narrative variety, Niharranjan Gupta often intertwined supernatural beliefs with settings like old aristocratic mansions and secluded locales, or with local legends, thereby evoking fear and curiosity in both his characters and his readers. The criminals in his stories exploited these common beliefs to serve their own ends. He utilized myths as vehicles for ancient beliefs, linking legends to specific places, people, objects, or events. In the conflict between belief and reason, the author consistently allowed reason to triumph, while simultaneously revealing human psychology and social realities lurking behind the supernatural facade. Niharranjan demonstrated this approach in stories such as 'Bouranir Bil', 'Manikundal', 'Bottrish Singhasan', 'Sarpil', 'Ratri Jokhon Gobhir Hoy' etc.

A physician by profession, Niharranjan incorporated folk beliefs and myths as narrative elements to lend a multidimensional quality to the atmosphere of mystery, yet he also exposed their limitations rather than indulging in them. His private detective, Kiriti Roy— a student of science— is a sharp-eyed, rational, and analytical sleuth with great foresight. Criminals could never prevail against him by weaponizing fear or blind superstition. Across numerous stories, the author pitted folk belief against rationality, ultimately ensuring the victory of logic, intellect, and science.

Humans are social beings, and crime does not occur in a vacuum outside of society. Religious superstitions, legends, notions of the supernatural, and myths often become deeply ingrained in the human psyche. A defining characteristic of myth is its oral nature and transmission through generations; myths serve as bearers of a culture's heritage. Often, they instill a sense of mystery, fear, and darkness in the human mind. These elements, too, vastly heighten the appeal of mystery stories. Criminals exploit people's vulnerabilities and fears to commit their crimes. Through logic and intellect, the detective transforms the mystery into a case substantiated by evidence; the

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 155 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

criminal is then apprehended and punished. Niharranjan has portrayed precisely this process.

Discussion

মানুষ সামাজিক জীব। অপরাধ সমাজের বাইরে হয় না। বহু মানুষের মনের রন্ধে রন্ধে বাসা বেঁধে থাকে ধর্মীয় সংস্কার, বিভিন্ন কিংবদন্তি, অলৌকিকতার ধারণা বা মিথ। মিথের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মৌখিকতা ও উত্তরাধিকার সূত্রে সংক্রমণ। মিথ অনেক জাতির কৃষ্টিরও বাহক। অনেকসময় এগুলি মানুষের মনে তৈরি করে রহস্য, ভয়, অন্ধকার। আর এগুলোও রহস্যকাহিনির আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। অপরাধীরা মানুষের সেই দুর্বল, ভয়ের জায়গার সুযোগ নেয়। অপরাধ করে। গোয়েন্দা যুক্তি ও বুদ্ধি বলে সেই রহস্যকে প্রমাণের জায়গায় নিয়ে আসেন। তখন অপরাধী ধরা পড়ে। তার শাস্তি হয়।

নীহাররঞ্জন পেশায় ডাক্তার। তিনি লোকবিশ্বাস ও মিথকে কাহিনির উপাদান হিসেবে নিয়ে রহস্যের আবহকে বহুমাত্রিক মর্যাদা দিয়েছেন ঠিকই তবে এগুলির সীমাবদ্ধতাকে দেখিয়েছেন। প্রশয় দেননি। তাঁর বেসরকারি গোয়েন্দা কিরীটী রায় বিজ্ঞানের ছাত্র। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, যুক্তিবাদী, বিশ্লেষণী শক্তিসম্পন্ন দূরদর্শি গোয়েন্দা। তার কাছে ভয় বা অন্ধ সংস্কারকে হাতিয়ার করে অপরাধীরা জিততে পারেনি কখনো। লেখক একাধিক গল্পে লোকবিশ্বাস ও যৌক্তিকতার মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি করে যুক্তি, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানকে জিতিয়ে দিয়েছেন।

'বৌরানীর বিল' গল্পে প্রমোদভবনের তিনদিক বৌরানীর বিল বেষ্টন করে আছে। বিলটি প্রশস্ত। বিলের এপারে ঝাউগাছের সারি রহস্যকে আরো ঘনীভূত করেছে। সত্যজিৎ অনুভব করেন বহু রজনীর প্রমোদ-বিলাসের কত অজানা কাহিনি ভবনটিতে আনন্দ-বেদনায় গুমরে উঠেছে। যারা একসময় এখানে আসত তাদের অশীরীরী দেহ এখনো হয়তো আসে। তিনি অনুভব করেন নূপুরের মিষ্টি ধ্বনি সিঁড়ি পথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কোনো অদৃশ্য মায়াবিনী যেন অন্ধকার থেকে হাতছানি দিয়ে তাঁকে ডাকছে। কানাইয়ের মা বলে বৌরানীর প্রেতাত্মা আজও নাকি নিশুতি রাতে ঘুঙুর পায়ে ঘুরে বেড়ায়। সে আরও বলে ওই বিলের জলে বৌরানী ডুবে মারা গিয়েছিলেন। তাই ওই বিলের নাম বৌরানীর বিল। সত্যজিতের মতো শিক্ষিত ব্যক্তিও শিহরণ অনুভব করেছেন—

> "চারিদিকে ঘন সন্নিবেশিত গাছপালা অদ্ভুত এক আলোছায়ার রহস্য দিয়ে ঘেরা। মধ্যে মধ্যে বায়ুর তাড়নায় বৃক্ষের পত্র ডালপালা আন্দোলন রহস্যময় এক শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করছে।
> মনে হয় কারা যেন চাপা গলায় ফিসফিস করে কি বলতে চায়।
> অদ্ভুত একটা শিহরণ সর্বাঙ্গে অনুভব করে সত্যজিৎ।
> অস্পষ্ট অনুচ্চারিত কার সাবধান-বাণী যেন বলছে, এগিয়ো না। এগিয়ো না! ওখানে মৃত্যু! ওখানে বিভীষিকা।"[১]

জমিদার বাড়ি নিয়ে বিভিন্ন কলঙ্ক কথা, মিথ, ভয় মানুষের মনে থাকে। বৌরানীর বিলে সাধারণ লোকজন প্রায় যায়না ভয়ে। তাই সেই নিরিবিলি জায়গা অপরাধীদের কাছে খুবই পছন্দের জায়গা। কিরীটী অন্ধকার রাতে একা সেখানে সাঁতরে গেছে। জমিদার বাড়ির বহুরহস্য উদঘাটন করেছে এবং অপরাধী চেৎ সিংকে ধরেছে।

'মৃত্যুবান' উপন্যাসে ট্রেনে ওঠার আগে সুহাসের ডানহাতে ছুঁচের মতো কি একটা ফুটল বলে মনে হল। তার হাতে ছোট রক্তবিন্দু দেখা গেল। এবং খানিকটা জায়গা জুড়ে দেখা গেল সামান্য ফোলা। সুহাসের মা মালতীদেবী গম্ভীর মুখে মৃদু স্বরে বলেছিলেন—

> "...অমাবস্যা তখনই বলেছিলাম। আজ না বের হলেই হত। কিন্তু তোদের সব আজকালকার সাহেবীয়ানা। ... এখন ভালয় ভালয় পৌঁতে পারলে বাঁচি।"[২]

সুহাসের ব্যথা কমা তো দূরের কথা হাতটা যেন অসাড় মনে হচ্ছিল ক্রমশ। জ্বর এসেছিল। একাধিক ডাক্তার দেখেছিলেন। কেউ সারাতে পারেননি। সুহাসের মৃত্যু ঘটল। 'অমাবস্যা নয়' প্লেগের জীবাণু ইনজেক্ট করে স্বার্থের জন্য সুহাসকে হত্যা করেছিলেন সুবিনয় মল্লিকেরা।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 155 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নৃসিংহ গ্রামের –

> "...পাহাড়ের উপরে ছোট একটি গুহার মধ্যে পাথরের তৈরি একটি নৃসিংহদেবের মূর্তি। সেই জন্যই জায়গাটির নাম নৃসিংহগ্রাম হয়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ধারণা যে নৃসিংহদেবের মূর্তিটি নাকি অত্যন্ত জাগ্রত। প্রতি শনিবার সেখানে সকলে পুজো দিয়ে আসে। তাছাড়া চৈত্র-পূর্ণিমাতে খুব ধুমধাম করে একবার পুজো হয়। সে-সময় সেখানে ছোটখাটো একটা মেলাও বসে।"[৩]

এরকম জাগ্রত দেবতাদের নিয়ে অনেক মিথ স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিরাজ করে। আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে 'অন্নবাবার মাঠ' বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসে 'কত্তাবাবা'-কে নিয়ে বিভিন্ন মিথ শুনে থাকব। কাহার বনওয়ারীরা সারাজীবন ধরে বিশ্বাস করে তাদের 'কত্তাবাবা' অত্যন্ত জাগ্রত। 'মৃত্যুবান' উপন্যাসে সাঁওতাল বা বাউরীরা শালকাঠের কারখানায় কাজ করে, চাষাবাদ করে সেই সঙ্গে নৃসিংহদেবের জাগ্রত মূর্তির পুজো করে। তাদের গ্রামের নামও দেবতার নামে 'নৃসিংহগ্রাম'। এরকম দেবদেবীর নামে গ্রাম পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে বহু জায়গায় আছে। হাওড়া জেলার আমতা থানায় দেবী সারদার নামে 'সারদা গ্রাম' (কবি ভারতচন্দ্র এই গ্রামেরই মেয়ে রাধাকে বিবাহ করেন) রয়েছে।

'রাত্রি যখন গভীর হয়' গল্পে সাঁওতালরা আর কলিয়ারীতে কাজ করতে চায় না কারণ তাদের বিশ্বাস এই খনিতে ভূত আছে। কুলীদের সর্দার রতন মাঝি এসে শঙ্করকে বলেছিল—

> "কিন্তুক তুরাই বল কেনে বাবু, প্রাণটি হাতে লিয়ে এমনি করে কেমনে কাজ করি!"[৪]

তিনজন ম্যানেজারকে হত্যা করে সুধাময় চৌধুরী কলিয়ারীতে বাঘের ডাক আর ভূতের ভয় দেখিয়ে বিশ্বাস ও আতঙ্ক তৈরি করে খনির কাজ বন্ধ করে দেন। খনিটা সবটা কেনবার উদ্দেশ্যে তিনি এসব করতেন।

'মণিকুন্ডল'-র কাহিনিতে নবাব সমশের আলীর বড়বেগম মণিকুণ্ডল সম্পর্ক কিরীটীকে বলেছিলেন—

> "হ্যাঁ, ওটা ছিল বেগম আলীর। বিবাহের পর পাঁচ-সাত বছরেও যখন তাঁদের কোন সন্তানাদি হল না তখন সন্তান কামনায় একবার তিনি আর তাঁর স্বামী নবাব ফকিরুদ্দীন আলী আগ্রার ফতেপুর সিক্রিতে বেড়াতে গিয়ে এক ফকির সাহেবের কাছ থেকে একজোড়া কুণ্ডল আশীর্বাদ হিসাবে পান। কুণ্ডলজোড়া ছিল সামান্য সরু তামার তৈরী-পরে নবাব সাহেব সেটা অর্থাৎ সেই তামার কুণ্ডলজোড়া সোনা দিয়ে মুড়িয়ে বারোটা বারোটা ছোট ছোট হীরা বসিয়ে বেগমকে দিয়েছিলেন। কারণ ফকির সাহেব বলেছিলেন, ওই কুণ্ডলজোড়া পরলে সন্তান হবেই এবং যতদিন কোন নারীর কর্ণভূষণ হয়ে থাকবে ততদিন সে থাকবে স্বামী-সোহাগিনী এবং স্বামী কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় পতিত হবে না। সেই থেকেই আমার স্বামীর বংশে রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল তাঁর বেগমরা ওই কর্ণভূষণ সর্বদা কর্ণে ধারণ করে থাকবেন।"[৫]

বড়বেগম মনে করেন ওই কুণ্ডল খোয়া যাবার পর থেকেই তাঁর স্বামীর ব্যবহারে রীতিমতো পরিবর্তন দেখছেন তিনি।

ছোটবেগম নুরেন্নেসা কিরীটীকে বলেন তাঁদের আয়রন সেফ খুলতে চাবির কাজ করে ওই কুণ্ডলজোড়া। তিনি আরও বলেন যে নবাব তাঁকে সেফ থেকে কিছু গয়না দেবেন শুনে এসব গল্প তৈরি করেছেন বড়বেগম। কুণ্ডলজোড়া বড়বেগমই নিজে সরিয়ে তাঁর নামে দোষ দিতে চান। কুণ্ডলজোড়া নিয়েই নবাব, তাজুদ্দিন, মরিয়ম, ছোটবেগম ও বড় বেগমের মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। নবাবের প্রাণ যায়। কিরীটীর কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হয় তাজুদ্দিন, মরিয়ম ও ছোটবেগম নুরুন্নেসা। বড়বেগম শেষে স্বীকার করেন কাহিনিটি বানানো।

'সর্পিল'-এর কাহিনিতে চিত্রাঙ্গদাদেবী বিশ্বাস করেন তাঁর কুষ্ঠিতে জন্মদিনের দিন অপঘাতে মৃত্যু যোগ ছিল এবং গল্পে সত্যি তা হয়েও ছিল। তবে ঘটনাটির পিছনে অন্য কারন আছে। অপরাধী সুরতিয়ার কাছে সবথেকে সুযোগের দিন ছিল ঐ দিনটি। কারন ঐদিন অনেক লোকসমাগম হত।

'বত্রিশ সিংহাসন'-এর কাহিনিতে ত্রিদীপনাথ রায়দের বংশের বত্রিশ সিংহাসনের কথা বলতে গিয়ে কাহিনির প্রথমেই লেখক রাজা বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনের কথা বলেছেন এবং প্রসঙ্গত এসে পড়েছে ভোজরাজের গল্প। বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনের সঙ্গে তিনি কাহিনির সংযুক্ত স্থাপন করেছেন এইভাবে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 155 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"কথিত আছে, গল্পের সেই রাজা বিক্রমাদিত্যের নাকি মণিমাণিক্যখচিত একটি বহু মূল্যবান রত্ন-সিংহাসন ছিল, এবং সেই সিংহাসনটির নির্মাণ-কৌশলও ছিল অদ্ভুত। বত্রিশটি পুতুল চারদিক থেকে সিংহাসনটিকে বেষ্টন করে থাকত।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর বহুকাল পরে, ভোজরাজ মৃত্তিকাতল থেকে সেই সিংহাসনটি উদ্ধার করেন। কিন্তু ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের সমগুণসম্পন্ন ছিলেন না বলে তাঁর আর সে সিংহাসনে বসা হল না কোন দিনই।

সিংহাসনটি উদ্ধার করবার পর প্রথম যেদিন ভোজরাজ সিংহাসনের ওপরে উপবেশন করতে গেলেন সিংহাসনের প্রথম পুতুলটি তাঁকে নিষেধ করল; বললে, মহারাজ! এই সিংহাসনে উপবেশনের পূর্বে আমার কিছু বলবার আছে, শ্রবণ করুন।

পুতুলটি বিক্রমাদিত্যের অশেষ গুণরাশির একটি কাহিনী বললে, এবং গল্পটি শেষ হলে বললে, মহারাজ, আপনাকে বিক্রমাদিত্যের সম্পর্কে যে গল্পটি বললাম, আপনার যদি সে-রকম কোন গুণ থাকে তবে সিংহাসনে উপবেশন করুন।

সেদিন আর ভোজরাজের সে সিংহাসনে উপবেশন করা হল না।

পরের দিনও অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পুতুলটি ভোজরাজকে সিংহাসনে উপবেশনে বাধা দিয়ে আর একটা গল্প শোনাল বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে।

এইভাবে বত্রিশটা পুতুল একের পর এক দিনের পর দিন সিংহাসনে বসতে ভোজরাজকে বাধা দিতে লাগল এবং ফলে ভোজরাজের আর কোনদিনও সেই সিংহাসনে বসাই হল না।

গল্পের ভোজরাজের মত শ্রীনগর রাজবাড়ির গৃহদেবতাদেরও তাঁরই জন্যই প্রস্তুত সুবর্ণ-নির্মিত কারুকার্য মণ্ডিত পান্নাচুনিহীরাখচিত বত্রিশ সিংহাসনটিতে বসাই হল না কোনদিন।

শ্রীনগর কোথায়, ভারতবর্ষের কোন্ জায়গায়-পূর্বে, পশ্চিমে, দক্ষিণে না উত্তরে সেটা আমাদের বর্তমান কাহিনীর প্রতিপাদ্য বিষয় নয়।

ধরে নেওয়া যাক বাংলাদেশেরই আশেপাশে কোথাও সেই শ্রীনগর, কলকাতা থেকে মাত্র একদিনের পথ।

পূর্ব কাহিনী যার সঙ্গে আমাদের বর্তমান কাহিনীর যোগসূত্র আছে, তা এই: শ্রীনগরের বর্তমান তরুণ রাজা ত্রিদীপনাথ রায়ের পুরুষানুক্রমে পাওয়া সম্পত্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান যে সম্পত্তিটি ছিল সেটি হচ্ছে ছোট একটি স্বর্ণ-নির্মিত রত্নখচিত সিংহাসন। সিংহাসনটিকে বত্রিশটি স্বর্ণনির্মিত পুতুল তাদের চৌষট্টি হাতে ধারণ করে আছে।

প্রায় সাত-আট পুরুষ আগে রাজবংশের সর্বেশ্বর রায় ঐ সিংহাসনটি নির্মাণ করে সোনার গোপাল প্রতিষ্ঠা করেন। সেই হতেই সিংহাসনটিকে বত্রিশ সিংহাসন নামে অভিহিত করা হত। সোনার গোপাল প্রতিষ্ঠা করবার কিছুকাল পরে হঠাৎ অদ্ভুত উপায়ে কোন অদৃশ্য লুণ্ঠনকারী রাজবাড়ির অন্দরমহলে অবস্থিত ঠাকুরঘর থেকে গৃহদেবতা সোনার গোপালটি লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়।

সমগ্র রাজবাড়িতে বিষাদের কালো ছায়া ঘনিয়ে এল অবশাম্ভাবী এক অমঙ্গলের দুশ্চিন্তায়। চারিদিকে অনুসন্ধান শুরু হল, কিন্তু বৃথা।

এমন সময় রাজমাতা কাত্যায়নী দেবী স্বপ্নে অপহৃত গৃহদেবতা সোনার গোপালের প্রত্যাদেশ পেলেন। ভয়ের কিছু নেই। অপহৃত হয়েছি আমি, আবার তোদের গৃহে সময় হলেই আসব। যতদিন না তোদের ঘরে আবার আমি প্রত্যাবর্তন করি, ততদিন শূন্য সিংহাসন সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রাখিস। ঐ বত্রিশ সিংহাসন যতদিন তোদের ঘরে থাকবে, কোন অমঙ্গলই তোদের স্পর্শ করতে পারবে না।

সেই থেকে এতদিন রত্নমণ্ডিত স্বর্ণনির্মিত বত্রিশ সিংহাসনটি রাজবাড়ির লোহার সিন্দুকেই তালাবন্ধ ছিল। গৃহদেবতাও আর প্রত্যাবর্তন করেননি, বত্রিশ সিংহাসনও আর কোন কাজে লাগেনি। রাজবাড়ির কোথাও কোন অমঙ্গলের চিহ্নও দেখা দেয়নি।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 155 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> সেই সিংহাসনটিই অকস্মাৎ কেমন করে অভাবনীয়রূপে রাজবাড়ির অন্দরমহলে অবস্থিত লৌহ-সিন্দুক থেকে লুণ্ঠিত হয়েছে।
>
> বহুকালের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বর্তমান রাজা ত্রিদীপনাথ রায় ঠিক করেছিলেন, লৌহ-সিন্দুক থেকে সোনার বত্রিশ সিংহাসনটি বের করে আবার নতুন সোনার গোপাল নির্মাণ করে দেবতার প্রতিষ্ঠা করবেন।
>
> স্বর্ণকারকে ডেকে মূর্তি গড়াবার আদেশও দেওয়া হয়েছিল এবং সোনার গোপালের নির্মাণকার্যও প্রায় সুসম্পন্ন হয়ে এসেছে।”[৬]

বিক্রমাদিত্যের প্রাচীন বত্রিশ সিংহাসনের লোকশ্রুত কাহিনির সঙ্গে লেখক শ্রীনগর রাজবাড়ির সোনার গোপাল ও প্রায় সাত-আট পুরুষ আগে সর্বেশ্বর রায় নির্মিত সোনার বত্রিশ সিংহাসনের কাহিনিকে মিলিয়ে দিলেন। সোনার গোপাল চুরি গেলে আসন্ন অমঙ্গল চিন্তায় রাজবাড়ি যখন সন্ত্রস্ত তখন রাজমাতা কাত্যায়নী দেবী গোপালের স্বপ্নাদেশ পেলেন কোনো অমঙ্গল হবে না বলে। তবে কোনো অমঙ্গল হয়নি। কিন্তু বত্রিশ সিংহাসনটি চুরি গেল।

শ্রীনগরের রানিমা মালতীদেবীর ভাই শশাঙ্কশেখর কিরীটীর সঙ্গে ট্রেনের সহযাত্রী হয়েছিলেন এবং তিনি বিনায়ক সান্যাল ছদ্মনাম ও ছদ্মবেশে কিরীটীকে শ্রীনগরের রাজবাড়ির কথা বলেছেন। এবং সেই রাজবাড়ির সাথে মিশে আছে লোকশ্রুত ঘটনা। তিনি বলেছেন—

> “হ্যাঁ, আমিও দু-একবার সেখানে গেছি। শ্রীনগরের রাজবাড়িই তো ইতিহাস প্রসিদ্ধ জিনিস একটা। পাল রাজত্বের সময়কার তৈরী সে প্রাসাদ। শুনেছি, সে নাকি এক রহস্যের খাসমহল।
>
> আপনি দেখেছেন সে প্রাসাদ?
>
> বাইরে থেকে যতটা সম্ভব, মানে বর্হিমহলটা সব ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম একবার। প্রাসাদের অভ্যন্তরে তো রাজারা কাউকে প্রবেশ করতে দেন না। রাজাদের একটা গেস্টহাউস আছে, রাজবাড়ি থেকে কিছু দূরে। সেখানে অনেকেই গিয়ে অনেক সময় থাকেন।তা ছাড়া পাল রাজাদের সময়ে কৈবর্ত সর্দার ভীমের উপদ্রবে রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল কিছুদিন নাকি ওখানে গিয়ে এক বাড়িতে ছিলেন, সেটাকে রামপালের দুর্গ বলে। হৃতসর্বস্ব রামপাল নাকি সেই বাড়িতে প্রায় দেড় বৎসর লুকিয়ে ছিলেন। ছোটখাটো একটা দুর্গের মত সে বাড়িটা। দুর্গের চারপাশে পরিখা, পরিখার চারপাশে প্রায় দেড় মানুষ সমান উঁচু পাথরের প্রাচীর।
>
> রামপাল নিজেই নাকি সে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন নিজের লোকজনদের দিয়ে এবং শোনা যায়, সেই দুর্গে বসেই তিনি সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন পরাক্রান্ত কৈবর্ত সর্দার ভীমের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্য।
>
> কৈবর্ত সর্দার সে কথা জানতে পেরে একদল দুর্ধর্ষ সৈন্য প্রেরণ করে রামপালকে বিধ্বস্ত করবার জন্য। দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা সেই দুর্গের মধ্যে আত্মগোপন করে রামপাল ভীমের প্রেরিত সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ চালান। শেষটায় কিছুতেই যখন আর দুর্গ রক্ষা করা সম্ভব হল না. তখন গোপনে পালিয়ে যান বর্তমান শ্রীনগরে যে রাজপ্রাসাদ তারই মধ্যে। আকারে ও চাকচিক্যে তখনকার সে প্রাসাদ বর্তমানের থেকে অনেক ছোটই ছিল, এবং মালিক ছিলেন সর্বেশ্বর রায়, সামান্য বিত্তশালী একজন ঐ সময়কার জমিদার মাত্র।
>
> রামপাল সর্বেশ্বরের গৃহে পনেরো দিন আত্মগোপন করে থাকেন। পরে সর্বেশ্বরের ঢালীরা রাতের অন্ধকারে পালকিতে করে রামপালকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে আসে।
>
> কিরীটী তন্ময় হয়ে মিঃ সান্যালের বর্ণিত কাহিনী শুনছিল। রূপকথার চমকপ্রদ, রহস্যঘন রোমাঞ্চকর...তারপর ঐ ঘটনার অনেক দিন পরে রামপাল যখন হৃতরাজ্য পুনরায় ফিরে পেলেন, সর্বেশ্বরের কাজের জন্য তাঁকে ইনাম দিলেন রাজা উপাধি ও অনেক নিষ্কর জমিজমা। সর্বেশ্বর তখন রামপালের সনদের জোরে রাজা উপাধি নিয়ে ঐ জায়গার নাম বদল করে 'শ্রীনগর' নতুন নামকরণ করলেন। সর্বেশ্বরের ভাগ্যলক্ষ্মী তখন সুপ্রসন্ন, দিনে দিনে দেবতার আশীর্বাদে তাঁর যশ, মান, প্রতিপ্রত্তি ও অর্থ বাড়তে লাগল। বর্তমানের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ তৈরী হল অতীতের ক্ষুদ্র জমিদার ভবনের ভিতের উপরে। বর্তমান শ্রীনগর ও সেই সঙ্গে শ্রীনগরের রাজাদের উৎপত্তির এই হল মোটামুটি ইতিহাস।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 155 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> গল্প বলতে বলতে পাইপটা নিভে গিয়েছিল। মিঃ সান্যাল পাইপটায় আবার অগ্নিসংযোগ করে একটা টান দিয়ে পীতাভ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, প্রায় বছর পাঁচেক আগে একবার শ্রীনগরে বেড়াতে গিয়ে ওখানকার এক বৃদ্ধের মুখে শ্রীনগরের এই ইতিহাস আমি শুনি।"[৭]

রামপাল ও শ্রীনগরের রাজাদের উৎপত্তির মিথ রাজবাড়ির বংশগৌরব ও ঐতিহ্যকে আরও মহিমান্বিত করে। গল্প কথক বলেছিলেন তিনি এক বৃদ্ধের মুখে কাহিনিটি শুনেছিলেন। গল্পের শেষে কিরীটী জানাচ্ছেন যে নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে শ্রীনগরের অত্যাশ্চর্য নির্ভুল কাহিনি তিনি কিরীটীর কাছে ব্যক্ত করেন। কিরীটীর এতে সন্দেহ তৈরি হয়। কারন একজন সাধারণ তৃতীয় পক্ষের পক্ষে রাজবাড়ির এতো পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। শশাঙ্কের অবশ্য এ কথা একেবারেই মনে হয়নি। নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাসে তিনি আবার কিরীটীর কাছে আসেন। কিরীটী শেষপর্যন্ত ধরে ফেলেন সিংহাসনটি শশাঙ্কই চুরি করেন।

'রত্নমঞ্জিল'-এর কাহিনিতে মৃন্ময়ী দেবী তাঁর মায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত দুখানা কঙ্কনজোড়া দিতে চাননি তাঁর মাকে। কারন তিনি বিশ্বাস করেন কঙ্কনজোড়া দিলে ভয়ানক রূপে অমঙ্গল দেখা দেবে। ছোটবেলায় তিনি শুনেছিলেন যে এই কঙ্কনজোড়া সন্ন্যাসী প্রদত্ত আশীর্বাদ এবং এই কঙ্কন যতদিন কোনো নারীর হাতে থাকবে ততদিন তাঁকে বৈধব্য স্পর্শ করবে না। কিন্তু তাঁর স্বামী শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী বলেছিলেন যে একটা কঙ্কন ফিরিয়ে দেবার জন্য। তখন তিনি তাঁর মাকে ফিরিয়ে দেবেন বলেন। অনিল বিশ্বাস করেন যে রত্নমঞ্জিলের নিচে রত্নভান্ডার আছে এবং তার সন্ধান তিনি যদি তিনি পান তাহলে রাজার হালে পায়ে পা তুলে তিনি বসে সারাজীবনটা আরামে কাটিয়ে দিতে পারবেন। অনিল একটা লালরঙের নোট বই পেয়েছিলেন শশাঙ্কমোহনের থেকে। সেটা ছিল শশাঙ্কমোহনের ডায়েরি। সেই ডায়েরিতে লেখা ছিল—

> "মন্ময়ী জানে না যে ঐ সুবর্ণকঙ্কনের কথা অনেকদিন আগেই আমি শ্বশুর মশাইয়ের কাছে শুনেছি। অনিলের জন্মের বছর দেড়েক আগে তিনি একদিন হঠাৎ সন্ধ্যেবেলায় বাইমহলে আমার ঘরে এসে হাজির হলেন। একথা সেকথার পর একসময় আমাকে বললেন, দেখ বাবা, তোমাকে আজ একটা কথা বলব। আমাদের পূর্বপুরুষদের কিছু সঞ্চিত হীরা জহরৎ ও বাদশাহী মোহর আছে। বাবা মৃত্যুর সময় আমাকে বলে গিয়েছিলেন, ঐ ধনরত্ন রত্নমঞ্জিলের ঐ নৈঋত কোণে যে শিংশপা-বৃক্ষটি আছে, তার গোড়া থেকে পূব কোণে এক জায়গায় মাটির নীচে একটি শিলাখন্ড প্রোথিত আছে, সেই শিলাখণ্ডের নীচে একটি ছোট লোহার সিন্দুকে সেই ধনরত্ন লুকানো আছে, সিন্দুকটির কোন চাবি নেই। সিন্দুকের ওপরে পাশাপাশি অনেকটা দুটি বলয়ের আকারে খাঁজ কাটা আছে। ঐ বলয়াকার খাঁজের মধ্যে দুটি কঙ্কন বসিয়ে চাপ দিলেই আপনা হতেই তখন সিন্দুকের ডালাটি নাকি খুলে যাবে। মীনুর হাতে যে দুটি সুবর্ণকঙ্কন দেখেছ, যা তোমার শ্বাশুড়ি তাকে দিয়েছেন, একমাত্র ঐ দুটি কঙ্কনের সাহায্যেই খোলা যায়। অন্য কোন কঙ্কন দিয়েই সিন্দুক খোলা যাবে না। শরীর আমার ইদানীং খারাপ যাচ্ছে। কবে আছি কবে নেই-তাই তোমাকে এই গোপন তথ্যটি বলে গেলাম। যদিচ এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই একমাত্র অধিকার আছে ঐ ধনরত্নে, তবু তোমাকে বলে রাখলাম এইজন্য যে আর তো পুত্র আমাদের হবে না, তোমরাই হবে সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।"[৮]

রত্নমঞ্জিলের নিচে রত্নভান্ডার থাকার বিশ্বাসে অনিল বহুদিন বহুকষ্ট করেছেন। রতনলাল রানাসহ অনেকেই সেই বিশ্বাসে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে গুপ্তরত্ন পাওয়া গেলেও এই কাহিনিতে গুপ্তসম্পত্তি কেউ-ই পাননি।

'পদ্মদহের পিশাচ'-এর কাহিনিতে নায়েব নরেনবাবু কলকাতা থেকে আগত জমিদারের পুত্র ও পুত্রবধূ সীতাংশু-রমলাকে বলেছিলেন জমিদার বাড়ির আশেপাশে গভীর রাতে বীভৎস চিৎকার হয়। লোকেদের বিশ্বাস পদ্মদহের জলে নাকি বিরাট দৈত্য বাস করে। রমলা ও সীতাংশু দুজনেই রাত্রিবেলা দেখেছিলেন বারো-তেরো হাত লম্বা, সাদা কাপড়ে মোড়া এক মূর্তি। পদ্মদহের ধার থেকে লম্বা লম্বা পা ফেলে হেলেদুলে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের পা অত লম্বা হয় না। এক একটা পা ফেলছে পাঁচ-ছয় হাত দূরে। মূর্তিটি হঠাৎ করে চিৎকার করছে। আবার সীতাংশু চোখ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 155 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বুঝলে পরক্ষণে আর ওই মূর্তিকে দেখতে পাননি। জমিদার বাড়ির পাশের প্রকাণ্ড বিলটার নামে পদ্মদহ। সীতাংশুর বাবা অরুণাংশুবাবুর মৃতদেহ পদ্মদহে পাওয়া যায় সেখানে। কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। চোখ দুটো যেন ঠেলে মণি থেকে বের হয়ে আসছে। মৃতদেহের পাশেই পদ্মদহের পাড়ে জলা মাটির ওপরে গোটা কতক স্বাভাবিক মানুষের পায়ের থেকে আকারে প্রায় দেড়গুণ বড় পায়ের দাগ দেখা যায়। সেই দাগগুলো ক্রমশ জলের দিকে শেষ হয়ে গিয়েছে।

সীতাংশুর পুত্র চম্পক বলেছিল— "...গরুড় পাখির মত সরু বাঁকানো নাক, প্যাঁচার মতো বড় বড় গোল চোখ, গাধার মত লম্বা লম্বা কান..."[৯] তাকে ভয় দেখায়। আসলে চম্পককেও অপরাধী মারতে চেয়েছিলেন। যেরকম মেরেছিলেন সীতাংশুর বাবা অরুণাংশুকে সম্পত্তি হাতানোর জন্য। লেখক ভৌতিক পরিবেশ গড়ে তোলেন কাহিনির বৈচিত্র্য আনতে। তবে ভুতের গল্প তিনি লেখেননি। বরঞ্চ গোয়েন্দা কিরীটীকে দিয়ে ভৌতিক পরিবেশকে ভেঙে দিয়েছেন। অপরাধী নায়েব নরেন বা যতীনকে তিনি ধরিয়ে দিয়েছেন। তাঁরাই বীভৎস চিৎকার, রণপা, কাঠের পা ইত্যাদি ব্যবহার করে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতেন অপরাধ করার জন্য।

'পঞ্চমুখী হীরা'-এর কাহিনিতে জমিদার বলদেববাবু তাঁর নায়েব প্রফুল্লকে বলেছিলেন অনেকদিনের সঞ্চিত ধন এই পঞ্চমুখী হীরা। তাঁর বিশ্বাস হীরা চুরিতে হয়তো তাঁর পূর্বপুরুষরা স্বর্গ থেকে তাঁর দিকে ঘৃণা ও লজ্জায় শিউরে উঠেছেন। এই হীরাটি তাঁদের বংশের এক পূর্বপুরুষ নবাবের কাছ থেকে সৎকার্যের পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছিলেন। বলদেববাবু বলেছিলেন এই পঞ্চমুখী হীরাই তাঁদের ঘরের লক্ষ্মী। সন্দীপবাবুকেও বলদেববাবু বলেছিলেন ওটা সংসারের লক্ষ্মী। হয়তো শেষপর্যন্ত সেই জন্যই হীরাটিকে বাঁচানোর জন্যই বলদেববাবু নিজেই চুরি করেছিলেন নিজের ঘর থেকে এবং রটিয়েছিলেন হীরাটি চুরি গেছে।

'যুগলবন্দী'-এর কাহিনিতে বকুল বলেছিল রজত নাকি পাঁচবছর বয়সে জলে ডুবে যায়। তখন রজতের বাবার গুরুদেব রজতের অপঘাত-মৃত্যুকে এড়ানোর জন্য কালোকর্ডে একটা মাদুলি বেঁধে ওর গলায় ঝুলিয়েছিলেন। সেইদিন থেকেই রজতের গলায় মাদুলিটা থাকত। রজত সেকথা বকুলকে বলেছিলেন। তবে শেষপর্যন্ত অপঘাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। এক্ষেত্রে মাদুলির গুণ কাজ করেনি।

'সামনে সমুদ্র নীল'-এর কাহিনিতে ২৯শে জুলাই অনুরাধা ও সরিতের প্রথম আলাপ হয় এবং দুজন-দুজনকে প্রথম সেদিন জেনেছিলেন। সেই ২৯ শে জুলাই ছিল মঙ্গলবার। সরিতের এক বন্ধু হিমাংশু তিনি গণনা করতে পারতেন। তিনি বলেছিলেন –

> "... মঙ্গলবারটা সব সময় এড়িয়ে যাবি সরিৎ, মঙ্গলে তোর জন্ম, সেদিন ছিল রাহু আর শনি মুখোমুখি, কোন ভাল কাজ ঐ মঙ্গলবারে করবি না, তোর পক্ষে সবচাইতে ভাল রবিবারটা।
> হেসেছিল সরিৎশেখর। বলেছিল, বোগাস!
> আজ হঠাৎ মনে পড়ছে সেদিনের সেই ২৯শে জুলাই ছিল মঙ্গলবার।"[১০]

কাহিনিতে অনুরাধার সঙ্গে সরিতের মিলন হয়নি। অনুরাধা খুন হয়েছিলেন। তবে সরিৎ এসব বিশ্বাস করতেন না।

'মানসী তুমি'-এর কাহিনিতে পরেশবাবু সুকুমারকে বলেছিলেন যে মানসী-হত্যা রহস্যটা খুঁজে বের করবেন তিনি। কারণ তাঁর জ্যোতিষী বন্ধু বঙ্কিমনারায়ণ চক্রবর্তী মানসীর কুষ্টি দেখে বলেছিলেন ওই বয়সে মানসীর মৃত্যু যোগ ছিল না। সে মরতে পারে না। কোনো দুর্ঘটনাতেও মৃত্যু যোগ তাঁর ছিল না। শেষপর্যন্ত অবশ্য দেখা যায় সাঁতারু মানসী বেঁচে ছিলেন। যদিও ব্যাপারটি কাকতালীয়। ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী মনে করেন -

> "মানুষের মানসিক দুর্বলতা, অনিশ্চয়তা, শুভাশুভ বোধ থেকেই লোক-বিশ্বাস ও সংস্কারের উদ্ভব। উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেও নিশ্চয়ই এর সঙ্গে যুক্ত করা চলে। লোকবিশ্বাস যেখানে একান্তভাবে একটা ধ্যান-ধারণা মাত্র ... প্রচলিত ধারণা নিরক্ষর মানুষই বুঝি কেবল লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কারের অধীন, তা কিন্তু নয়, শিক্ষিত মানুষও কম বেশি বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাবাধীন। পূর্বে যেখানে মূলতঃ অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাস ছিল এর মূলে, বর্তমানে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় যুগ, অনিশ্চয়তা এবং সেই সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানুষকে বেশি করে সংস্কারাধীন করে তুলছে বলা যেতে পারে।"[১১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 155 - 162
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নীহাররঞ্জনের কাহিনিতে বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও 'মানসিক দুর্বলতা, অনিশ্চয়তা, শুভাশুভ বোধ' বা 'অনিশ্চয়তা' থেকে অশুভ শক্তি, ভূত-প্রেত, অলৌকিক নানা ঘটনা, মন্ত্র, অভিশাপ, শুভাশুভ লক্ষণ, ভাগ্যের ফের ইত্যাদিকে বিশ্বাস করেছেন। রহস্য তৈরির ক্ষেত্রে বা কাহিনির বৈচিত্র্য আনার জন্য নীহাররঞ্জন পুরাতন জমিদারবাড়ি, নির্জন স্থান, লোকশ্রুত ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে অলৌকিক বিশ্বাস যুক্ত করে কাহিনির সাধারণ পাত্রপাত্রী ও পাঠকের মনে ভয় ও কৌতূহল সৃষ্টি করেছেন। তাঁর অপরাধীরা সাধারণ মানুষের এই বিশ্বাসকে ব্যবহার করেছেন নিজস্বার্থ চরিতার্থ করতে। লেখক মিথকে ব্যবহার করেছেন অতীত বিশ্বাসের বাহক হিসাবে। কোনো স্থান, ব্যক্তি, বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন কিংবদন্তিকে। বিশ্বাস বনাম যুক্তির দ্বন্দ্বে যুক্তিকেই জিতিয়ে দিয়েছেন লেখক। সেই সঙ্গে অলৌকিকতার আড়ালে মানুষের মনস্তত্ত্ব, সামাজিক বাস্তবতাকেও ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।

Reference:

১. গুপ্ত, নীহাররঞ্জন, 'কিরীটী অমনিবাস' (১), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পঞ্চবিংশ মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৯, পৃ. ২৫৬-২৫৭
২. গুপ্ত, নীহাররঞ্জন, 'কিরীটী অমনিবাস'(৩), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ষোড়শ মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৮, পৃ. ১৪১
৩. তদেব, পৃ. ২১১
৪. তদেব, পৃ. ২৯৩
৫. গুপ্ত, নীহাররঞ্জন, 'কিরীটী অমনিবাস' (৬), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, দশম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২৫, পৃ. ২১২-২১৩
৬. গুপ্ত, নীহাররঞ্জন, 'কিরীটী অমনিবাস' (১২), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ত্রয়োদশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪৩১, পৃ. ১৪১-১৪২
৭. তদেব, পৃ. ১৪৪-১৪৫
৮. তদেব, পৃ. ৩০৭-৩০৮
৯. গুপ্ত, নীহাররঞ্জন, 'কিরীটী অমনিবাস' (১৩), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, দশম মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৮, পৃ. ২৭৫-২৭৬
১০. গুপ্ত, নীহাররঞ্জন, 'কিরীটী অমনিবাস' (১৫), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩, দশম মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২৮, পৃ. ১০৯
১১. সম্পাঃ, চক্রবর্তী, বরুণকুমার, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ, দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩, তৃতীয় পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও নতুন আঙ্গিক সংস্করণ : জানুয়ারি ২০১৬ পৃ. ৫৩৯